কিশোরী মুক্তিযোদ্ধা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ফেব্রুয়ারির প্রথম-দিকে একজন তার লেখা একটা বই আমাকে উপহার দিলেন। বইটার নাম 'একাত্তরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা'-বইয়ের লেখক নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধা, তার নাম মেজর হামিদুল হোসেন তারেক বীর বিক্রম। এই দেশের অন্য দশজন মানুষ থেকে আমি অনেক বেশি সৌভাগ্যবান। আমি মুক্তিযোদ্ধা নই, একাত্তরে আমি অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধ করিনি, তারপরেও এ দেশের মুক্তিযোদ্ধারা আমাকে তাদের নিজেদের একজন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাদের অনেকে চিঠি লিখে তাদের জীবনের অসাধারণ কাহিনী আমাকে বলেছেন, অনেকে তাদের লেখা বই আমাকে উপহার দিয়েছেন। এমনকি একজন আমাকে তার লেখা একটি বই উৎসর্গ করেছেন। আমাদের দেশের এ স্বর্ণসন্তানদের ভালোবাসা কীভাবে ফিরিয়ে দেব আমি বুঝে পাই না।

'একাত্তরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা' (ঐতিহ্য প্রকাশনী), বইটির প্রচ্ছদে একটি অভূতপূর্ব ছবি রয়েছে। ছবিটি একাত্তরের, একজন শিশু দুই কাঁধে দুটি মর্টারের গোলা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে। ছবিটি দেখে চট করে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছে হঠাৎ করে তাদের চোখের সামনে অসংখ্য স্মৃতি এসে ভিড় করে। যারা দেখেনি তারা অবাক বিস্ময়ে ভাবে একাত্তর সালে ঠিক কী ঘটেছিল, যার জন্য একটা দুধের শিশুও দুই কাঁধে মর্টারের গোলা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু পিছু শত্রুসেনা নিধনযজ্ঞে এভাবে এগিয়ে যায়? একটা শিশুকে যুদ্ধের মাঠে অস্ত্র কিংবা গোলাবারুদ হাতে এগিয়ে যেতে দেখে বর্তমান সময়ের 'সভ্য' মানুষেরা নিশ্চয়ই শিহরিত হয়ে উঠেন। কিন্তু এ দেশে একাত্তর সালে সেটা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি তার সেনাবাহিনী নিয়ে কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতায় পৈশাচিকভাবে এ দেশের মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেটি যারা নিজের চোখে দেখেনি তারা কোনোদিন বিশ্বাস করতে পারবে না। পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা দেখে বড় হওয়া এ নতুন প্রজন্ম কোনোদিন অনুভব করতে পারবে না একটা দেশ আর তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এত প্রবল ঘৃণা নিয়ে আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি। সেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে পুরোপুরি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া একটা পরিবারের কোনো একটি শিশু যখন প্রতিশোধের স্পৃহা নিয়ে তার হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল একাত্তর সালে সেটি কারো কাছে এতটুকু অস্বাভাবিক মনে হয়নি। সেটি ছিল একটি অসম যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে টিকে থাকতে না পারলে একটা জাতি তার ঐতিহ্য আর গৌরব নিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত! সেই যুদ্ধে শিশু আর কিশোররাও যে হাতে অস্ত্র তুলে নেবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

'একাত্তরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা' বইটি ছোট। বাংলাদেশের সব মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে একটি বই লেখা হলে সেটি বিশাল একটি বই হয়ে যেত-তখন যারা যুদ্ধে গিয়েছে তাদের একটা বড় অংশই তো ছিল কিশোর। এ বইয়ের লেখক সব কিশোর মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে লিখেননি, তিনি লিখেছেন শুধু যাদের তিনি দেখেছেন, যারা তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে-তাদের নিয়ে। বইটির লেখক মেজর হামিদুল হোসেন তারেক বীর বিক্রম নিজেকে কখনো 'লেখক' হিসেবে দাবি করেননি, কিন্তু তারপরেও তার লেখার ক্ষমতা বিস্ময়করভাবে অসাধারণ। একজন ঔপন্যাসিক বা গল্পকার যখন বানিয়ে বানিয়ে একটা কাহিনী লেখেন তখন পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য তাকে পুরোপুরি তার লেখার কৌশলের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু একজন মানুষ যখন তার নিজের জীবনের ঘটনাটি লেখেন তখন সেই সত্য কাহিনীটুকুই মানুষকে কৌতূহলী করে তোলে। এ বইটিতেও তাই হয়েছে-সাতটি সত্য কাহিনী পাঠকের সামনে মুক্তিযুদ্ধের একটি নতুন অধ্যায় খুলে দিয়েছে।

বইটির সাতটি কাহিনীর একটি একজন কিশোরীর গল্প। লেখক হামিদুল হোসেন তারেক তখন একজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধের একপর্যায়ে এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। বাড়ির একটি কিশোরী মেয়ে তার কাছে যুদ্ধাস্ত্র চালানো শিখতে চাইল! তিনি তাকে কেমন করে গ্রেনেড চার্জ করতে হয়, সেটা শিখিয়ে দিলেন। হঠাৎ করে সেই

গ্রামে চারদিক থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ করে বসেছে, মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদে সরে যেতে পারছে না। সেই মেয়েটি তখন নিজে থেকে এগিয়ে এসে কীভাবে গ্রেনেড চার্জ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আটকে রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদে সরে যেতে দিল, সেই অসাধারণ সত্য ঘটনাটি বইটিতে লেখা আছে। গল্পটা পড়ার সময় আমি কল্পনার সেই কিশোরীটিকে দেখতে পাই, দেশের জন্য গভীর মমতায় বাংলার শ্যামল কোমল মাটিতে গড়ে ওঠা কিশোরী একটা মেয়ে কীভাবে সিংহীর মতো তেজস্বী হয়ে ওঠে, সেটি আবার নতুন করে অনুভব করি। একাত্তরে এ দেশে মেয়েরা শুধু নির্যাতিত হয়নি, তারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধও করেছে, সবাইকে আমাদের সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

এ বইটি পড়তে পড়তে আমি আবার নতুন করে অনুভব করেছিলাম ১৯৭১ সালটি ছিল একটি অসাধারণ সময়। যাদের আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখে এসেছি, দেশের ডাকে রাতারাতি তারা অসাধারণ মানুষে পাল্টে গেল। দেশের জন্য গভীর মমতায় একটি প্রজন্ম নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে এগিয়ে গিয়েছিল-শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ, চাষি-মজুর সবাই ছিল সেই যুদ্ধে। সেই সময় মতিউর রহমান নিজামীর মতো রাজাকার কমান্ডাররা ছিল নেহাতই হাতেগোনা কয়েকজন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সরাসরি সাহায্য পেয়েছিল বলে এই ক্ষুদ্র দেশদ্রোহীরাই দেশের বুদ্ধিজীবী হত্যা থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় সর্বনাশ করতে পেরেছিল। কিন্তু সেটি ভিন্ন ইতিহাস, স্বাধীনতা দিবসে এ দেশদ্রোহীদের নাম উচ্চারণ করা হলে বাংলাদেশের অপমান করা হয়।

মেজর হামিদুল হোসেন তারেক বীর বিক্রমের এই বইটির পড়ে মনে হয় আমাদের দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের এ একটি অধ্যায়কে হয়তো পুরোপুরি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়নি। শুধু যে কিশোরেরা যুদ্ধ করেছে তা নয়, এ দেশে কিশোরীরাও যুদ্ধ করেছে। আমি তখন নতুন করে অন্য একটি বই আবার খুলে দেখেছি। বইটির নাম 'আমি নারী আমি মুক্তিযোদ্ধা' (অন্য প্রকাশ), সম্পাদনা করেছেন সেলিনা হোসেন; বইটিতে একান্নজন নারী মুক্তিযোদ্ধার কথা লেখা আছে। সারা দেশ ঘুরে যারা এ নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কাহিনী খুঁজে বের করে এনেছেন তাদের জন্য আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। বইটিতে অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধার জন্ম তারিখ দেওয়া আছে, সেখান থেকে হিসাব করলে দেখা যায় একাত্তর সালে তাদের অনেকেই ছিলেন কিশোরী। আমাদের দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অনেক সাহিত্য রচনা হয়েছে, গল্পগাথা লেখা হয়েছে, তার প্রায় সবখানেই তারা পুরুষ। মেয়েদের যখন আনা হয়েছে তাদের দেখানো হয়েছে নির্যাতিত হিসেবে, ধর্ষিত হিসেবে। কিন্তু তারাও যে হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছেন সেই কাহিনী তো এখনো লেখা হলো না। শুধু নির্যাতনের গল্প পড়ব, বীরত্বের গল্প পড়ব না-সেটা তো হতে পারে না।

আমাদের প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধকে নিজের চোখে দেখেছে, এ মহান বিষয়টির জন্য এ প্রজন্মের বুকে এক ধরনের গভীর মমতা রয়েছে। আমাদের পরের প্রজন্ম সেটি দেখেনি, তাদের বুকের ভেতর ঠিক একই ধরনের আবেগ থাকবে আমরা সেটি আশা করতে পারি না। সবচেয়ে বড় কথা, খুব ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করে, নানা ধরনের বিভ্রান্তির জন্ম দিয়ে পুরো প্রজন্মটিকে দেশ এবং দেশপ্রেম সম্পর্কে নিস্পৃহ করে তোলা হয়েছে। সম্ভবত তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের জন্য একটি শর্টকাট খুঁজে বেড়াবে, কোনো চলচ্চিত্র, কোনো টেলিফিল্ম, বড়জোর কোনো উপন্যাস। তাই সেই প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পৌঁছে দিতে হলে শুধু হত্যা এবং ধর্ষণের কথা বললে হবে না, বীরত্ব এবং বিজয়ের কথাও বলতে হবে।

২.

ফেব্রুয়ারি মাসে আমি আরো একটি বই উপহার পেয়েছি। বইটির নাম বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর স্মারকগ্রন্থ (আগামী প্রকাশনী)। বইটির লেখিকা মিলি রহমান আমাকে বইটি উপহার দিয়েছেন। মিলি রহমানের আরো একটি পরিচয় রয়েছে, তিনি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের স্ত্রী। বীরশ্রেষ্ঠ একটি মরণোত্তর খেতাব। যারা এটি পেয়েছেন সেই সাতজনই দেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহস, বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ করে এ সর্বোচ্চ খেতাবটি পেয়েছিলেন। বইটি খুলে দেখার আগেই আমার যে কথাটি মনে হয়েছে সেটি হচ্ছে একজন বীরশ্রেষ্ঠের স্ত্রী নিজের উদ্যোগে তার স্বামীর

কাহিনীটুকু তুলে ধরেছেন বলে ইতিহাসের একটি অজানা অধ্যায়ের কথা আমরা জানতে পেরেছি। অন্য আরো যে ছয়জন বীরশ্রেষ্ঠ আছেন তাদের নিয়ে কী কখনো কোনো স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হবে? আমরা কী তাদের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনার কথা আমাদের প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারব?

আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে এ বইটি পড়েছি, আগে যখন বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের যুদ্ধবিমান নিয়ে উড়ে যাওয়ার কাহিনীটুকু পড়েছি তখন সেটা ছিল পুরোপুরি একটা সাহস আর বীরত্বের কাহিনী। তার স্ত্রী মিলি রহমান যখন গভীর ভালোবাসায় তার স্বামীর সেই অসাধারণ বীরত্বের কাহিনীটুকু লিখেছেন তখন সেই সাহস আর বীরত্বের কাহিনীটুকুর সঙ্গে যোগ হয়েছে ভালোবাসার একটি মানবিক কাহিনী। একজন মানুষ একই সঙ্গে তার দেশকে এবং স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালোবাসে, একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সে দেশের জন্য ভালোবাসার টানে একটি যুদ্ধবিমানকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, পরিণামে তার স্ত্রী এবং সন্তানরা নিক্ষিপ্ত হবে ভয়ঙ্কর শত্রু শিবিরে। সবকিছু জেনেশুনে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান যুদ্ধবিমানকে ছিনিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সাহসী সৈনিকের কাছে সেটা হয়তো সহজ কিন্তু যেটি সহজ নয় সেটি হচ্ছে তার স্ত্রীর কাছে সেই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনার কথা খুলে বলা! স্ত্রী মিলি রহমান সবকিছু জেনেশুনেও তার স্বামীর সেই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনায় বাধা দেননি-সম্ভবত সেটি হচ্ছে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। দেশের সবচেয়ে বড় দুঃসময়ে যোদ্ধাদের পেছনে সাহস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের স্ত্রীরা। তখন কতই বা বয়স মিলি রহমানের, ছোট ছোট দুটি শিশু নিয়ে শত্রুকবলিত দেশে রয়েছেন। যুদ্ধবিমানটি ছিনতাই করে নেওয়ার পর সেই শত্রু দেশে বিশ্বাসঘাতকদের স্ত্রী হিসেবে ধিকৃত হবেন তবু তিনি বিচলিত হননি। ১৯৭১ সালে সেই তরুণীর সাহস আর মনোবলের কাহিনী পড়ে এতদিন পরও আমরা রোমাঞ্চিত হই। এ রকম একজন স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে না থাকলে কি এত সহজে একজন বীরশ্রেষ্ঠ জন্ম নিতে পারে?

আজ থেকে ৩৪ বছর আগে এ দেশে যে মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস একটু একটু করে আমাদের লিপিবদ্ধ করে যেতে হবে। যারা যুদ্ধ করেছেন, যারা যুদ্ধ দেখেছেন তারা সেটা লিখে যেতে শুরু করেছেন। 'ইতিহাস বিকৃতি'কে ভয় পেলে চলবে না, এটি সাময়িক একটি অপচেষ্টা, সত্যের জোয়ারে সব ধুয়ে-মুছে ভেসে যাবে। যখন আমরা কেউ থাকব না তখন শুধু এ লেখাগুলো থাকবে। চোখের অশ্রু এবং বুকের রক্ত দিয়ে লেখা। দেশদ্রোহী যুদ্ধাপরাধীদের বিষ নিঃশ্বাসে এ মুহূর্তে হয়তো আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু আজ থেকে বহু বছর পরে তারা থাকবে না। আমাদের সেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের দেশের সেই গৌরবের কথাগুলো রেখে যেতে হবে।

সেই গৌরব ছিল নারী এবং পুরুষের- কিশোর এবং কিশোরীর, এ দেশের সূর্যসন্তান অগণিত মুক্তিযোদ্ধার।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল : লেখক। অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।